নেতাজির খোঁজখবর

অনুপ চট্টোপাধ্যায়

পুনশ্চ

নিবেদন

অডিও ভিস্যুয়াল সাংবাদিকতাকে আজ যাঁরা পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন, তাদের একদল কাজটা শুরু করেছিলেন দিব্যজ্যোতি বসুর নেতৃত্বে। খাসখবর-এ। আমি তাঁদেরই একজন। সাংবাদিক হিসেবে কলম ধরেছি খবর লেখার জন্য। 'বুম' (মাইক্রোফোন) ধরেছি, টিভিতে খবর দেখানোর জন্য। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও, বই লেখার তেমন কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু আমার এ ইচ্ছা পূরণে এগিয়ে এলেন দিব্যদা। ২০০৬ সালে ১৬ জানুয়ারি থেকে খোঁজখবরে শুরু হয়েছিল নেতাজির অন্তর্ধ্যান রহস্য নিয়ে অনুসন্ধান মূলক গবেষনাধর্মী অনুষ্ঠান- 'নেতাজির খোঁজখবর'। প্রতি সপ্তাহেই। এক সময় এ অনুষ্ঠান অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে বাংলা, আসাম, ওড়িশা, ঝাড়খন্ড, ত্রিপুরা, মনিপুর সহ রাজধানী দিল্লিতেও। এক-একটি সপ্তাহ পার করে একসময় পৌছে গেছিলাম শততম পর্বে। তবুও থেমে থাকেনি 'নেতাজির খোঁজখবর'। দেশের এ প্রান্ত-সে প্রান্ত থেকে চিঠি আসে দফতরে, ই-মেল আসে দিব্যদার কাছে। বই আকারে প্রকাশ করুন 'নেতাজির খোঁজখবর'। মানুষের রায় শুনে উদ্যোগ নেন খোঁজখবর-এর কর্ণধার। আমাকে বলেন, 'শুধু অডিও ভিস্যুয়ালে নয়, এবার কলম ধরতে হবে তোকে। লিখতে হবে নেতাজির খোঁজখবর।'

ব্যস, দিব্যদার উৎসাহে শুরু হল নেতাজির খোঁজখবর বই লেখার কাজ। তথ্য-নথি অনেক সংগ্রহ করেছি। মুখার্জি কমিশন চলাকালিন যা 'এক্সজিবিট' করা হয়েছিল। সাক্ষীদের সহায়তায় খোঁজখবর-এর নানান পর্বে তা দেখানো হয়েছে। সেই সংগ্রহশালা থেকে একেকটি তথ্য-নথির সাহায্য নিয়েই লেখা এ বই। খোদ সরকারি মহাফেজখানার নথি। এমন প্রচেষ্টা অতীতে হয়েছে কিনা জানা নেই, তবে চেষ্টা করেছি বইটিকে প্রামান্য গ্রন্থ হিসেবে পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার।

যথেষ্ট উৎসাহ পেয়েছি পূরবীদির (ড: পূরবী রায়, নেতাজি গবেষক) কাছে। শুধু মাত্র তথ্য-নথির হদিশ দিয়ে নয়, সতর্ক করেছেন নথির সঠিক মূল্যায়নে। আমি তাঁর কাছে ঋণী। সহযোগিতা পেয়েছি সুনীলকৃষ্ণ গুপ্তর কাছে, যিনি তিন-তিনটি কমিটি কমিশনের কাজে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। সুরজিৎ দাশগুপ্ত, ডা: মধুসূদন পাল, নন্দলাল চক্রবর্তী, চান্দ্রেয়ী আলম, রুদ্রজ্যোতি ভট্টাচার্য-রা যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। প্রেরণা জুগিয়েছেন বর্ষীয়ান শিক্ষাবিদ ড: অমলেন্দু দে, দেবকুমার বসু, সুনন্দ সান্যাল এবং আইনজীবি কাশীকান্ত মৈত্র। প্রবীণ রাজনীতিক অশোক ঘোষ, সাংসদ বরুন মুখোপাধ্যায়, ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা নরেন চট্টোপাধ্যায় এবং নেতাজির পরিবারের ললিতা বসু, গীতা বিশ্বাস, চিত্রা ঘোষ, সুব্রত বসু, সূর্যকুমার বসু, মাধুরী বসু, ডি. এন. বসু, চিত্তপ্রিয় বসুরা নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। আমার সহকর্মী সৌমিত্র শংকর লাহিড়ি, সাজি জন, কৌশিক চ্যাটার্জি, অসীম দত্ত এবং সুশীতল দাসরা না থাকলে এত বড় দায়িত্ব নেওয়া কঠিন হতো। বাড়িতে লেখার কাজে আমাকে রসদ জুগিয়েছে আমার ছেলে রূপ (অর্মত্য) ও স্ত্রী ঝুমা চট্টোপাধ্যায়। আড়ালে থেকে তথ্য জুগিয়েছেন এক সংস্থা, যাঁরা প্রচার বিমুখ। প্রকাশনা সংস্থা 'পুনশ্চ' খুব কম সময়ের মধ্যে এই বই প্রকাশ করার ক্ষেত্রে যে সাহস দেখিয়েছে তার জন্য আমরা সন্দীপ নায়ক-এর কাছে কৃতজ্ঞ।

আসলে সত্য উদ্ঘাটন করা দিব্যদা-র লক্ষ্য। অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ টিম খোঁজখবরের পথ। কবির ভাষায়— 'ভালো মন্দ যাহাই আসুক সত্য-রে লও সহজে'-সত্য যদি মন্দ হয়, তাহলেও তা গ্রহণ করা উচিৎ। আমাকে-আপনাকে এবং সরকারকেও।

বইটির এই খণ্ডে তিনটি কমিটি-কমিশনের রিপোর্টের অংশবিশেষ সহ আয়ারের রিপোর্ট এবং তাইওয়ান সরকারের রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে। পাঠকদের জন্য। আর এই রিপোর্ট হাতের কাছে থাকলে বাড়তি সুবিধা হবে গবেষকদেরও। যার কারণে আরও অনেক তথ্য নথি এই খণ্ডে দেওয়া যায়নি। তোলা রইল পরবর্তী খণ্ডের জন্য।

আজ ২১ অক্টোবর। আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠার দিন। এই পবিত্র দিনে 'নেতাজির খোঁজখবর' বইটির প্রকাশ আমাকে আরও উৎসাহিত করছে।

২১ অক্টোবর, ২০০৮ — অনুপ চট্টোপাধ্যায়

সল্টলেক, কলকাতা-৯৭

সূচিপত্র

নেতাজির খোঁজখবর	....	১৫-২৬৪
প্রথম অধ্যায়	....	১৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	....	৭১
তৃতীয় অধ্যায়	....	৯১
চতুর্থ অধ্যায়	....	১২৯
পঞ্চম অধ্যায়	....	১৮৫
ষষ্ঠ অধ্যায়	....	২১১
শাহনওয়াজ কমিটি রিপোর্ট	....	২৬৫-৩৩৮
জাস্টিস খোসলা কমিশ্যনের রিপোর্ট	....	৩৩৯-৬২৪
জাস্টিস মুখার্জি কমিশনের রিপোর্ট	....	৬২৫-৬৮৮

প্রথম অধ্যায়

সুইডিশ ডিপ্লোম্যাট রউল ওয়ালেনবার্গ বুদাপেস্টে গিয়েছিলেন ইহুদিদের বাঁচাতে—নাৎসী বাহিনীর আক্রমণ থেকে। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের টালমাটাল সময়। শুধুমাত্র মানবিকতার তাগিদে। নিরপেক্ষ এক দেশের বাসিন্দা হিসেবে। কখন জানেন, ঠিক যেসময় রুশ বাহিনী ঢুকে পড়েছে বুদাপেস্টে। ৩২ বছরের যুবক ওয়ালেনবার্গ ও তাঁর হাঙ্গারিয়ান ড্রাইভার তখন থেকেই 'ভ্যানিশ'। হ্যাঁ, vanish forever। কিন্তু কেন 'ভ্যানিশ' ওয়ালেনবার্গ? কি হল তাঁর? এসব নানান প্রশ্ন উঠতে থাকল। আসলে তখন রুশ সরকার জানিয়েছিল, ওয়ালেনবার্গ তাদের হাতে মারা গেছেন। কিন্তু রুশ বাহিনীর হাতে ওয়ালেনবার্গ কিভাবে গেলেন, কখন তাঁকে 'অ্যারেস্ট' করা হল, কখন কিভাবে তিনি মারা গেলেন, মেলেনি তার সঠিক উত্তর।

অদ্ভুত মিল আমাদের দেশনায়ক সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সুইডিশ যুবক ওয়ালেনবার্গের। দু'জনের অন্তর্ধান ঘিরেই রয়েছে রহস্য, যার কেন্দ্রবিন্দু সেই রাশিয়ায়। দুটো ঘটনাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ঘটেছিল। তফাত শুধু ওয়ালেনবার্গের রহস্য উন্মোচনে উদ্যোগী তাঁর দেশ, কিন্তু নেতাজির অন্তর্ধান রহস্যের জট খুলতে নারাজ ভারত সরকার। বরং নেতাজিকে মৃত বলে প্রমাণ করতেই মরিয়া ছিল নেহরু-গান্ধির সরকার। কিন্তু কেন? কেন ভারতের শ্রেষ্ঠতম এক সন্তানের বিরুদ্ধে চক্রান্ত চালানো হয়েছে সরকারি মদতে? কেন তথ্যপ্রমাণ ছাড়া তাঁকে 'মৃত' হিসেবে প্রচার করার উদ্যোগ নিয়েছিল স্বাধীন ভারতের প্রথম সরকার? নেতাজির অন্তর্ধান রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য গঠিত তদন্ত কমিটি—কমিশনকে কিভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা হয়েছিল—সেসব চাপা দেওয়া তথ্য-নথি আপামর দেশবাসী নেতাজি অনুরাগীদের সামনে তুলে ধরার তাগিদেই এই বই।

তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনা শুধু মিথ্যা কাহিনিই নয়, তা সত্য বলে প্রমাণ করার যে চেষ্টা নেহরুর আমল থেকে চলে আসছে তার হদিশ মিলেছে সরকারি মহাফেজখানায়। কি প্রমাণ? চলুন ১৯৫১ সালে। বিদেশ মন্ত্রকের গোপন ফাইল নম্বর ২৫/৪/এন জি ও. ভল-১। কেন্দ্রীয় সরকারের বিদেশ দপ্তরের কমনওয়েলথ রিলেশনস-এর সচিবপদে তখন সুবিমল দত্ত। তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার কাহিনি কতখানি সত্য, নাকি পুরোপুরি মিথ্যা তা নিয়ে দোটানায় সরকার। সংসদে বার

বার প্রশ্ন উঠছে—ওই দুর্ঘটনা সম্পর্কে সরকারের বক্তব্য কী? কারণ তখনও পর্যন্ত সরকারিভাবে ১৯৪৫-এর ১৮ আগস্ট-এর প্রসঙ্গে কোনো রিপোর্ট সংসদে দাখিল করতে পারেনি কেন্দ্রীয় সরকার। আসলে সংসদে বলার মতো সামান্যতম তথ্যও নেহরু-র কাছে সেদিন ছিল না। অথচ তিনি মনে-প্রাণে চেয়েছিলেন তথাকথিত দুর্ঘটনার কাহিনিকে সত্য বলে প্রচার করতে। ঠিক এইরকম একটা সময়ে S. A. Iyer-এর সাহায্য নেন নেহরু। বিদেশ মন্ত্রকের ওই ফাইলে ১৯৫১ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর একটি নোটের উল্লেখ আছে। প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের জন্য ওই নোট, লিখেছেন J. Nehru অর্থাৎ জওহরলাল নেহরু। লিখেছেন—S. A. Iyer আমার সঙ্গে দেখা করে জানিয়েছেন যে তিনি জাপান গিয়েছিলেন এবং সেখানে তদন্ত করেছেন। আর সেই বিমান দুর্ঘটনা,যার কারণে মৃত্যু হয়েছিল সুভাষচন্দ্র বসুর—তা নিয়ে জাপানে আয়ার যে তদন্ত করেছিলেন তার রিপোর্টও জানিয়েছেন তাঁকে। আসলে এই নোটের ছত্রে ছত্রে নেহরু এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন আয়ারের রিপোর্ট সম্পূর্ণ সত্য, অতএব সংসদে সেই রিপোর্ট পেশ করার কথা ভাবছেন তিনি। নোটে লিখেছিলেন, I am inclined to think that it would be desirable to issue some statement or to make it in parliament. *(তথ্য-পৃষ্ঠা ৪৪)*

আয়ারের রিপোর্ট যে তাঁকে অনেকটা আশ্বস্ত করেছিল তা বোঝা যায় নেহরু-র ওই নোটে। তবে চতুর নেহরু জানতেন দেশবাসীর 'pulse'। তাই নোটের শেষ অংশে বলা হয়েছিল—'I think the best course would be for us to draft some such statement and to send it to Shri Subhas Chandra Bose's family, After hearing from them, we should take a final decision about publication'. কিন্তু বাস্তবে বসু পরিবারে ওই রিপোর্ট পাঠানো তো দূর অস্ত সংসদে তা পেশ করার আগে পর্যন্ত বসুপরিবারের কারও সঙ্গে তা নিয়ে আলোচনা পর্যন্ত করেননি নেহরু।

আর নেহরু-র এই নোট সচিবালয়ে পৌঁছতেই প্রধানমন্ত্রীর জন্য পালটা নোট তৈরি করেছিলেন তৎকালীন বিভাগীয় সচিব সুবিমল দত্ত। নম্বর ৩৩৩৭। ১৯৫১-এর ২৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো বিদেশ দপ্তরের ওই সচিবের সেই নোটের প্রথম লাইনটি ছিল এরকম—'I told P.M. that it would be inadvisable for him to make a statement now.' অর্থাৎ এস. এ. আয়ারের রিপোর্ট-এর ভিত্তিতে সংসদে কোনো statement দেওয়া এখনই ঠিক হবে না। কিন্তু বিদেশ সচিব এ ধরনের সাবধান বাণী কেন লিখেছিলেন তাঁর নোটে। উল্লেখ আছে

তারও। সুবিমল দত্ত লিখছেন, হবিবুর রহমানের বক্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ কেন-না উনি বলেছেন নেতাজির গন্তব্যস্থল ছিল দাইরেন and to the intention of the Japanese authorities to let him cross over to the Russian hold territory. অর্থাৎ জাপানিরা তাঁকে সেখানে পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

আসলে হবিবুর রহমানের এইসব বক্তব্য যে নেহরু-আয়ারদের বিশ্বাসের বিপক্ষে তা বুঝেছিলেন ওই বিদেশ-সচিব। তাই প্রধানমন্ত্রীকে আগাম সতর্ক করে দিতে চেয়েছিলেন। এখানেই শেষ নয়, ওই নোটের শেষ অংশে সুবিমল দত্ত যা লিখেছিলেন তা আরও ভয়ংকর। তিনি লিখেছেন, হবিবুরের বক্তব্য অনুযায়ী মৃতদেহ সৎকার করা হয় ২০ আগস্ট। 'কিন্তু তাইপে মিউনিসিপ্যালিটির তথ্য অনুযায়ী মৃতদেহ সৎকার করা হয় ২২ আগস্ট সন্ধ্যা ৬ টায়। আসলে বিচক্ষণ আমলা সুবিমল দত্ত বুঝেছিলেন গরমিল আছে হবিবুর রহমানের বক্তব্যে। তাই এসব বক্তব্য ঘিরে সন্দেহ বাড়বেই। প্রথমত যিনি মারা গেছেন বলে জানানো হয়েছে তাঁর নাম ইচিরো ওকুরো, মৃত্যুর কারণ হার্ট অ্যাটাক্। মৃত্যুর তারিখ যা ডেথ সার্টিফিকেটে আছে তা হল ১৯ আগস্ট, ১৮ নয়। এসবের পরেও সৎকারের তারিখও দু'রকম। অর্থাৎ হবিবুরের বয়ানে ২০ আগস্ট আর সার্টিফিকেটের হিসেবে ২২ আগস্ট। বিদেশ সচিব তাই লিখেছিলেন, One could understand a fictitious name being used in the death certificate and in the cremation certificate, but there was no necessity of using a fictitions date of cremation. *(তথ্য-পৃষ্ঠা ৪৫)* হ্যাঁ, কেন্দ্রীয় সরকারের মহাফেজখানায় রাখা আছে এইসব দলিল দস্তাবেজ। সবকিছু এখনও আসেনি, যা পেয়েছি তা থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় কত বড় চক্রান্ত রয়েছে নেতাজির অন্তর্ধান রহস্য ঘিরে। সুবিমল দত্ত-র এই নোট দেখলেই বোঝা যায় তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার সত্যতা নিয়ে সন্দেহ ছিল তাঁর। তাই নিজের মতটুকু ওই নোটে লিখেও প্রধানমন্ত্রী নেহরু-কে খুশি করার জন্য জানান, Either Habibur Rahaman's must have played him false or there is something wrong with the cremation certificate. ভেবে দেখুন, বিদেশ সচিব একই নোটের ওপরের লাইনে লিখেছেন, ডেথ সার্টিফিকেট এবং সৎকারের তালিকায় নাম বদলে ইচিরো ওকুরো করা হয়েছিল—তা যদিও বা বিশ্বাস হতে পারে কিন্তু সৎকার-এর দুটো তারিখ কেউ মেনে নেবে না। অর্থাৎ ওই নোটে তিনি পরিষ্কার বলতে চেয়েছিলেন ঘটনাটি আদৌ সত্য কিনা তা নিয়ে সন্দেহ থাকবেই। কিন্তু খোদ প্রধানমন্ত্রীকে নোট দিচ্ছেন, সেখানে এর থেকে বেশি আর কিছু লেখা যে সমীচীন হবে না, তা তো জানতেন দত্তসাহেব। তাই পদ ও মান দুই বাঁচাতে

লিখেছিলেন, হয়তো হবিবুরের স্মৃতিভ্রম হয়েছে। নতুবা Cremation Certificate-এ ভুল আছে। যে কোনো সাধারণ মানুষই নোটের এই ক'লাইন পড়লেই বুঝতে পারবেন একজন বিচক্ষণ আমলার কলম থেকে এসব শব্দ তোষামোদ ছাড়া আর কিছু নয়। কেন নয় জানেন, ঘটনা ১৯৪৫-এর। আর নোট লেখা হচ্ছে ১৯৫১ সালে। নেতাজির অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহচর হবিবুর রহমানের স্মৃতি এতই দুর্বল যে ৬ বছর আগের ঘটনাও তাঁর মনে ছিল না। তাও যে সে ঘটনা নয়, তাঁর প্রিয়তম নেতার তথাকথিত দুর্ঘটনা প্রসঙ্গের খবর। যা একেবারেই অস্বাভাবিক। সুবিমল দত্ত-র দ্বিতীয় যুক্তি Cremation Certificate-এ হয়তো ভুল ছিল। ভাবুন একবার, ওই সার্টিফিকেটে বাকি সবকিছুই ওদের কাছে ঠিকঠাক ছিল শুধু তারিখটুকু ছাড়া। আসলে সবসময় পাশে পাশে ছিলেন হবিবুর রহমান। অথচ তাঁর দেওয়া তারিখের সঙ্গে ইচিরো ওকুরো সৎকার-এর তারিখ না মেলাতেই যত গণ্ড গোল। তা হলে? হবিবুর রহমান কি মিথ্যা কথা বলেছিলেন? হ্যাঁ, সুবিমল দত্ত-র এই নোট সেই সংকেতই দেয়। বিদেশ মন্ত্রকের এই শীর্ষ স্থানীয় অফিসার সেদিন বুঝেছিলেন শুধুমাত্র আয়ারের রিপোর্ট-এর উপর ভরসা করে সংসদে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি দেওয়া উচিত হবে না। কারণ শুধুমাত্র হবিবুর রহমানের বিবৃতির গরমিল নয়, যিনি এই Report বানিয়ে দিয়েছিলেন অর্থাৎ এস. এ. আয়ার, তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও তখন কেন্দ্রীয় সরকারের আমলা মহলে চলছিল আলাপ-আলোচনা। আসলে তথাকথিত দুর্ঘটনার কাহিনি প্রথম তৈরি করেছিলেন এই আয়ার। ১৯৪৫-এর ১৭ আগস্ট সায়গন থেকে যখন সেই বোমারু বিমান নেতাজিকে নিয়ে তাঁর গন্তব্যস্থলের দিকে চলে যায় তখন সেই বিমান বন্দরে হাজির ছিলেন আজাদ-হিন্দ ফৌজের ৬ জন সদস্য—কর্নেল হবিবুর রহমান, আবিদ হাসান, দেবনাথ দাস, প্রীতম সিং, এস. এ. আয়ার এবং গুলজারা সিং। হবিবুর রহমান ওই বিমান যাত্রায় সঙ্গী ছিলেন নেতাজির। এই পাঁচজনের মধ্যে একমাত্র আয়ার ছাড়া আর কেউ তথাকথিত দুর্ঘটনার কাহিনি একেবারেই বিশ্বাস করেননি। কারণ এরা জানিয়েছেন, ওই দুর্ঘটনা যা প্রচার করা হয়েছিল তার কোনো প্রমাণ মেলেনি। সায়গন বিমানবন্দরে ১৭ আগস্ট হাজির থাকা এইসব সেনানীদের বক্তব্যের সমর্থনে তথ্য পরে আবার তুলে ধরব তার আগে আয়ারের কাহিনি জেনে রাখা দরকার। একসময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রয়টারের প্রতিনিধি ছিলেন তিনি। সাংবাদিক এস. এ. আয়ার পরে রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ইন্ডিয়ান ইনডিপেন্ডেন্স লিগের সঙ্গে যুক্ত হন। ঘনিষ্ঠতা হয় লিগের সিঙ্গাপুর শাখার সভাপতি রামমূর্তির সঙ্গে। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আজাদহিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই আয়ার হন প্রচার দপ্তরের মন্ত্রী। ১৭ আগস্ট সায়গন বিমানবন্দর থেকে

নেতাজিকে বিদায় জানানোর পর জাপানিদের সঙ্গে ছিলেন আয়ার। কি ঘটেছিল তারপর তা নিয়ে পরবর্তীকালে একটি বই লিখেছিলেন তিনি—UNTO HIM A WITNESS। বইতে মি. আয়ার নিজেকে একজন সাক্ষী হিসেবে প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন। কেমন সাক্ষী—তা জানতে হলে আয়ারের ওই বইতে ঢুকতে হবে। তিনি লিখেছেন, সায়গন থেকে ২০ আগস্ট জাপানিদের বিমানে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় টোকিয়ো-র দিকে। বিমানে যাওয়ার সময় জাপানি নৌবাহিনীর রিয়ার অ্যাডমিরাল চুদা (CHUDA) তাঁকে তথাকথিত দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যুর খবরটি দেন। এই খবর তিনি বিশ্বাস করেননি। যেতে চেয়েছিলেন ঘটনাস্থলে। লিখেছেন—"You must now take me at once to Taihoku. I must see Netaji's body with my own eyes. I must meet Habib. Don't tell me afterwards that Netaji's body has been disposed off, and don't tell me that Habib is not in a condition to be seen. Whatever happens, I must be taken to Taihoku."

মজার কথা কী জানেন, এতসব কথা হওয়ার পরও ওই বিমান কিন্তু তাইহোকু যায়নি। তাইচু এয়ারপোর্টে নেমে যায়। আয়ার কিন্তু তখনও বলেছেন, "No Indian in India or East Asia is going to believe your story of Netaji's plane crash." জাপানি অফিসার কর্নেল টি (সাংকেতিক নাম) জানান, "I shall do my best. We have already told Taihoku to take photos and collect all positive evidence of the accident." UNTO HIM A WITNESS-বই অনুযায়ী ২০শে আগস্ট থেকে ২২ আগস্ট পর্যন্ত ওরা বিমানে যাত্রা করেছেন। সায়গন থেকে যাত্রা শুরু করে আবার সায়গনে ফিরে এসেছেন। পরে সেখান থেকে গেছেন ক্যান্টনমেন্টে। সেখান থেকে উড়ে তাইচু। কিন্তু তাইহোকু যাননি। ২২ আগস্ট অর্থাৎ তথাকথিত দুর্ঘটনার ৪ দিন পর আয়ার লিখেছেন, I pointed out that according to them Netaji's plane crashed on the 18th of August and he died in the same night. It was already 22nd of the month, that is four full days had passed and not a word had been publicly announced either by the Japanese Government or by the provincial government of free India about the calamity. *(তথ্য-পৃষ্ঠা ৪৮)*

এখানে লক্ষণীয়, এস. এ. আয়ার যিনি নিজেই লিখেছেন তথাকথিত দুর্ঘটনা স্থলে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়নি, dead body দেখানো হয়নি, এমনকী জীবিত হবিবুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্যন্ত করতে দেওয়া হয়নি, সেই তিনি আবার death news প্রচার করার তাগিদ অনুভব করছেন। আর এ বিষয়ে জাপানিদেরকে উদ্যোগ নিতে